রণজিৎ গুহ ও আমাদের প্রজন্ম : ইতিহাস-চর্চাপদ্ধতি থেকে মননচর্চা

উর্বী মুখোপাধ্যায়

গত শতাব্দীর শেষভাগে ইতিহাসচর্চার আঙিনায় ভারত তথা দক্ষিণ এশিয় ইতিহাস হঠাৎই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের সায়াহ্নে যাঁরা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার কাজে গিয়েছিলেন তাঁদেরও ভারত থেকে আসা বলে হঠাৎ মর্যাদা বেড়ে যায়। কারণ তখন প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই ইতিহাস রচনাপ্রক্রিয়ায় নতুন ধারা হিসেবে সাবল্টার্ণ স্টাডিজ অবশ্যপাঠ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়, এবং সে প্রসঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষত ঔপনিবেশিক যুগের ভারতের ইতিহাস, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মনে আছে সে সময়ে রণজিৎ গুহ, পার্থ চ্যাটার্জী বা দীপেশ চক্রবর্তীর নাম ছিল সকলের মুখে মুখে। এমনকি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিকেরা ভারত বা দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে আগ্রহীও নন তাঁরাও রাষ্ট্র ও জাতির মত দুটি প্রতিষ্ঠানের টানাপোড়েনের মধ্যে কীভাবে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ঘাত বা সংক্ষোভ এক মূর্ততা লাভ করে তা বিশ্লেষণের জন্য সাবল্টার্ণ স্টাডিজের শরণাপন্ন হতেন।

আমাদের মতো সমাজ বিশ্লেষণীদের মধ্যেও সে সময়ে বিশ্বায়নের বাজারে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে এই মডেলের জনপ্রিয়তা বা স্বীকৃতি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। মনে হত, বাস্তবিক ভাবেই সাবল্টার্ণ স্টাডিজ প্রান্তীয় মানুষের ধারণা, বিশেষত পশ্চিমি দুনিয়ার বাইরে, নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সাবল্টার্ণ বলতে মার্ক্সীয় ধারণাকে অতিক্রম করে শোষিতশ্রেণী ছাড়াও অন্তেবাসী উপজাতিক, দলিত এবং নারী ক্ষমতা-বৃত্তের বাইরে এক নিরন্তর লড়াইয়ে শামিল ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মর্যাদা লাভ করেছে। অর্থাৎ যাকে পরিভাষায় বলে History from below তার এক নতুন ধারণা তৈরি হয় এবং এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে ইতিহাসচর্চার মূল আলোচ্য বিষয় ও আঙ্গিকেও এক চূড়ান্ত পরিবর্তন আনে। ইতিহাস রচনা মানে শুধুমাত্র মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তথ্যের আখ্যান নয় বরং সে তথ্যসূত্র কার ইতিহাস সংরক্ষণ করে বা কেন করে অথবা কখন করে তার অনুসন্ধানও ইতিহাস গবেষণার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের ক্ষমতাবৃত্তের বাইরের মানুষের মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধানে তথ্যসুত্রে সংরক্ষিত বয়ানেও অশ্রুত কণ্ঠস্বরের প্রতি ইতিহাসবিদকে সচেতন হওয়ার পাঠ শেখানো শুরু হয়, ফলে ইতিহাসের চেনা পরিধির বাইরে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়ে ইতিহাসের বৈচিত্র্য বাড়ায়। এ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের ধারণা অভ্যস্ত ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসে।

আমরা যখন নয়ের দশকে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ঢুকেছি তখন সদ্যপ্রয়াত

রণজিৎ গুহের 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধটির বয়স প্রায় এক দশককাল। তাঁর পি এইচ ডি গবেষণা-ভিত্তিক বই রুল অফ প্রপার্টি ফর বেঙ্গলও তখন ইতিহাস ছাড়াও সাহিত্য বা দর্শনের গবেষকদের কাছে পরিচিত নাম। ১৯৮৮-তে বেরিয়ে গেছে রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী স্পিভাক সম্পাদিত সিলেক্টেড সাবল্টার্ণ স্টাডিজ। সাবল্টার্ণ স্কুলের বক্তব্য বিবৃত ইতিহাসের ধারণা তখন নতুন গবেষণার আঙ্গিকে চর্চা-পদ্ধতি, সামাজিক প্রকোষ্ঠ, তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি সব ক্ষেত্রেই এক বিতর্কিত বিষয়। তখন অনেকেই সন্দিহান এমনকি সাবল্টার্ণ স্টাডিজের মূল দাবি নিয়ে যে তাঁরা নিম্ন বর্গের ইতিহাস লিখছেন। এ কথা ঠিক যে সাবল্টার্ণদের আবির্ভাবের অনেক আগেই ইতিহাসে নিম্নকোটি মানুষ ও তার সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ সালে ই পি টমসনের The Making of the English Working Class প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নিচ থেকে সামাজিক ইতিহাসের ভাষ্য রচনা যথেষ্ট জনপ্রিয়। ১৯৮২ সালে এরিক উলফের লেখা America and the People without History প্রকাশিত হলে পরে এই ভাষ্যে অন্তেবাসী মানে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণি নয়, অন্যান্য নিপীড়িত জনগণও এ পর্যায়ভুক্ত হয়। ফলে ইতিহাসচর্চায় মার্ক্সবাদী ধারাকে অতিক্রম করে শ্রেণিতত্ত্বের বাইরেও নতুনভাবে নিপীড়িতের এক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চাতেও এই ঢেউ এসে লাগে। ১৯৭০-এর দশক থেকেই ভারতেও নিপীড়িত মানুষের ইতিহাস, বিশেষত সংখ্যাগুরু অত্যাচারিত গোষ্ঠী হিসেবে কৃষকদের ইতিহাস গুরুত্ব পেতে থাকে। ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চাতেও কৃষি ইতিহাসের গুরুত্ব বৃদ্ধিকে সরাসরি 'ইতিহাসে কৃষকদের পুনরুত্থান' হিসেবে উল্লেখ করেন। সাবল্টার্ণ স্টাডিজ প্রকাশের আগে থেকেই কৃষক সম্প্রদায়ের পৃথক ইতিহাস এ আর দেশাই লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সাবল্টার্ণ স্টাডিজ প্রকাশের আগেই এই নিচ থেকে ইতিহাস প্রেক্ষণের ধারা ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসে যথেষ্ট জনপ্রিয় ধারা রূপে স্বীকৃত ছিল। তাহলে এ ইতিহাস চর্চায় নতুনত্ব কোথায়? এ প্রশ্ন তখন বিদ্যাচর্চার জগতের আনাচে-কানাচে। অনেকে বলছেন, সাবল্টার্ণরা আদতে মার্ক্সবাদী, তবে একটু ভিন্ন মোড়কে। যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছেন তাঁরা গ্রামশির মতো মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদদের ব্যবহৃত সাবল্টার্ণ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত সিলেক্টেড সাবল্টার্ণ স্টাডিজ-এর ভূমিকায় সাবল্টার্ণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রণজিৎ গুহ Concise Oxford English Dictionary-তে উল্লিখিত সাবল্টার্ণ শব্দটির অর্থ উল্লেখ করলেও সে শব্দের গ্রামশিয়ান ব্যবহার ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংযোগ বিশেষ উল্লেখ করেননি। রণজিৎ গুহ বরং নতুনভাবে সাবল্টার্ণ শব্দটির ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় স্পষ্টত পক্ষপাতিত্ব আছে এলিট শ্রেণির প্রতি। এই এলিটরা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসক নন, শাসকের সহযোগী দেশীয় জাতীয়তাবাদী-সাংস্কৃতিক এলিটরাও এর পর্যায়ভুক্ত যাঁদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আধিপত্য প্রলম্বিত হয়েছে উপনিবেশোত্তর ভারতীয় ভূখণ্ডেও। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার প্রথাগত প্রতিপক্ষ এখানে গুলিয়ে যায় — এখানে লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বিদেশি ঔপনিবেশিক বনাম স্বদেশি জাতীয়তাবাদীরা নয়, এখানে লড়াই বাধে এলিট ও নিপীড়িতদের মধ্যে, যে নিপীড়িতদের হাজারও বঞ্চনার কারণে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সরাসরি সংরক্ষিত হয় না সরকারি মহাফেজখানার নথিতে। এই প্রেক্ষিত থেকে ভারতীয় ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ইতিহাসচর্চার ধারাও কাঠগড়ায় উঠে আসে। কারণ ইতিহাসচর্চায় প্রথাগত মার্ক্সীয় শ্রেণি-বিশ্লেষণী ধারাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতাবৃত্তের অনুমোদন সম্পৃক্ত তথ্যভিত্তি এবং প্রথাগত সামাজিক প্রকোষ্ঠ নিয়ে প্রশ্নহীনতায় দুষ্ট বলে মনে করেন সাবল্টার্ণরা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যদি মহাফেজখানা তথ্যসূত্রের আকর না হয়, তাহলে ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের সূত্র কোথায় মিলবে? সুতরাং মহাফেজখানা-নির্ভর ইতিহাসবিদদের

অনেকেরই এই বিকল্প ইতিহাস-চর্চা পদ্ধতির রূপ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগে, ফলে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়।

মনে আছে, স্নাতক পর্বের ক্লাসে এক অধ্যাপক আমাদের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা পড়াতে গিয়ে সাবল্টার্ণ স্কুলকে কেম্ব্রিজ স্কুলেরই এক ধারা হিসেবে উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি অবশ্য কেম্ব্রিজ স্কুলের অনুগামী হিসেবে সাবল্টার্ণদের মহাফেজখানার নথি প্রীতি ছিল কি ছিল না সে বিতর্কে যাননি। তাঁর যুক্তি ছিল, কেম্ব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকেরা যেভাবে স্বদেশি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ইতিহাস অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ঔপনিবেশিক-বিরোধিতার মধ্যে অন্তর্ঘাতের অনুসন্ধান প্রয়াসী, এই সাবল্টার্ণ ঐতিহাসিকেরাও একই ভাবে গোষ্ঠী সংঘাতকে তুলে ধরে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের ইতিহাস কালিমালিপ্ত করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের ইতিহাসচর্চায় সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্য হল ফিশার বা চ্যুতি তুলে ধরতে জাতীয়-জাগরণের পিছনে জনমানসের সংযুক্ত আবেগের ধারাকে অস্বীকার। এর ফলে জাতি এবং রাষ্ট্রের ইতিহাসের মধ্যে একরৈখিক গ্রন্থির ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায় — জনগণের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আর এলিট নেতৃবর্গ দ্বারা পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন যেন পরস্পরবিরোধী ধারায় পরিচালিত হতে থাকে। অর্থাৎ তাঁর মতে সাবল্টার্ণ স্কুলকে কোনোমতেই মার্ক্সবাদী ধারার বাহক বলা যায় না, তথাকথিত জাতীয় নেতৃত্বের সমালোচনার মূল সুর এখানে গ্রথিত হয়েছিল কেম্ব্রিজ স্কুলের ঘরানায়, যেখানে আদতে জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে এক পরস্পরবিরোধী স্বার্থবাহী অভ্যুত্থানের ইতিহাসে চিত্রিত করে আদতে তার পরাভবের ইতিহাসই বর্ণিত হয়।

এ কথা ঠিক, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ভারতীয় রাষ্ট্র-গঠন ও তার পরিচালনা সম্পর্কে নানা সমালোচনা উঠে আসছিল ছয়ের দশকের শেষ থেকেই। কিন্তু সাতের দশকে একদিক দিয়ে নকশালপন্থী অভ্যুত্থান অন্যদিকে জরুরি অবস্থা-জাত সর্বব্যাপী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষোভ জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই যোগসূত্র নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। ফলে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাতেও জাতীয় সমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ চ্যুতি ও বহুমুখী স্বার্থবাহী ভিন্ন উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা বিদ্বৎমহলে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতেই সাবল্টার্ণ স্টাডিজ জাতি এবং রাষ্ট্রকে বহুমাত্রিক রূপে উপস্থাপন করলে তা স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাই আমাদের শিক্ষকদের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও আমরা সে সব বই পড়তে উৎসাহী হয়ে উঠি।

তাই প্রথমেই শুরু করি রণজিৎ গুহের রচনা। বয়সোচিত কৌতূহলেই রুল অফ প্রপার্টি পড়তে বসি। প্রথম চমক লাগে এই বইয়ের সাবটাইটেলটি দেখে, অ্যান এসে অন দ্য আইডিয়া অফ পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট। পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সঙ্গে তার আগে আমরা পরিচিত এক সাম্রাজ্যবাদী রাজস্বনীতি হিসেবে। তার পিছনে আইডিয়া বা ধারণার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা তখন সম্পূর্ণ অর্বাচীন। এ গ্রন্থের অনুসন্ধানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত, সেখানে শুধুমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এক নীতি বা তার প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং তার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন ছোটবড় ঘটনাক্রম নয়, বরং কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরেও ইতিহাসে আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — মনন ও ন্যায্যতাবোধের এক সমসাময়িক তাৎপর্যনির্ভর এক সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের যুক্তিগ্রাহ্যতা। সেখানে এই বিস্তারিত ধারণার বিবর্তনের প্রেক্ষিতও পরিকাঠামো নির্মাণ-পদ্ধতি বোঝার জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই সেখানে বড় করে উঠে আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা আসে এবং তাকে কেন্দ্র করেই কীভাবে এক আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এ বাংলায়। এ ধরনের বিশ্লেষণ ক্ষমতাবৃত্তের নির্মাণে একাধারে মানসিক ও চৈতন্য জগতের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে — যার সূত্র ধরেই শ্রেণিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ নির্ধারিত হয়।

ফলে এক নতুন ধরনের ঐতিহাসিক যোগসূত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ আমাদের সামনে রাষ্ট্র ও নিপীড়ন পদ্ধতির এক নতুন দিক তুলে ধরে। পাশাপাশি রণজিৎ গুহের রচনা পদ্ধতিতে যেটা আমাদের আলোড়িত করে তা হল, প্রশ্নের ব্যাপ্তি। নিজে খাস তালুকদার বংশোদ্ভূত হওয়ায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও থাকবন্দি সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি বহুকালের। ছাত্রজীবনের শেষে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিনহার সঙ্গে কাজের সূত্রে তাঁর গ্রামীণ ক্ষেত্র সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দর্শন এই গবেষণার প্রাণশক্তি হয়ে উঠেছিল।

মূলত প্রান্তীয় মানুষের প্রতিরোধস্পৃহাকে সার্বিকভাবে বোঝার জন্য রণজিৎ গুহের কাছে জরুরি ছিল ক্ষমতাসীনের মনন ও চৈতন্যের বিশ্লেষণ। এই সূত্রেই প্রকাশিত হয় তাঁর এলিমেন্টারি অ্যাস্পেক্টস অফ পেজেন্ট ইন্সারজেন্সী ইন ইণ্ডিয়া। এ গ্রন্থ রচনার ইতিহাসও বড় বিচিত্র। তিনি নাকি ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলনে গান্ধির ভূমিকা নিয়ে কাজ শুরু করেও পরে সিদ্ধান্ত নেন কৃষক আন্দোলনের উপরে কাজ করার। এ সিদ্ধান্ত বদলের কারণ সঠিকভাবে জানা না গেলেও মনে হয় কৃষক মনন অনুধাবন তাঁর কাছে সব সময়েই অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে ফুকোর পাশাপাশি গ্রামশির মতো মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরাও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন, কারণ প্রান্তীয় মানুষের কাছে প্রতিরোধের সংকল্প প্রাত্যহিক থেকে উঠে এলেও তার নির্মিতি মুহূর্ত তৈরি হয় এক জটিল ধারায়, যার অনেক চিহ্নই থাকে না প্রথাগত ঐতিহাসিক সূত্রে, থেকে যায় মুখের কথায়, অগ্রন্থিত ইতিহাসে।

তাঁর ডমিনেন্স উইথ আউট হেজিমনিতে গ্রামশির তত্ত্ব আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তাঁর ঔপনিবেশিক সমাজের ক্ষমতা বিশ্লেষণে। শুধু সাবল্টার্ণের মতো শব্দই নয়, রণজিৎ গুহের সমাজপ্রেক্ষণে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক গ্রামশির প্রভাব নানাভাবে এসে পড়েছিল। ফ্যাশিস্ট ইতালির কারাগারে বন্দি গ্রামশির পূর্বতন ঘটনার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ রণজিৎ গুহকেও আলোড়িত করে। সেই অনুসন্ধানই কি তাঁকে নিয়ে যায় ‘উত্তরণ’ প্রশ্নে? জীবনের সায়াহ্নে এসে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, আন্দোলনের ইতিহাসও আদতে এক উত্তরণের ইতিহাস। যে কোনও মানুষের মতোই প্রান্তীয় সমাজের মানুষেরাও এক বিচারের আশায় সংঘবদ্ধ হয়, বলা যেতে পারে এও এক প্রান্তীয় চৈতন্যের উত্তরণ।

উত্তরণ প্রসঙ্গ তাঁর লেখাতে বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর শেষ ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ হিস্ট্রি অ্যাট দ্য লিমিট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে এই উত্তরণ প্রশ্নে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। প্রশ্ন জাগে, ১৯৮৩ তে সাবল্টার্ণ ধারার জনক কেন সরে আসেন কৃষক চৈতন্যের অনুধাবন প্রসঙ্গ থেকে? নাকি তাঁর এই নতুন অনুসন্ধান আদতে সেই উত্তরণ প্রসঙ্গের সঙ্গেই সম্পৃক্ত? সাহিত্যের সঙ্গে মননের যোগ অনেক আগে থেকেই তাঁর কাজে প্রতিভাত হচ্ছিল, কিন্তু এ গ্রন্থে তিনি জোর গলায় বলেন ইতিহাসচর্চা যে ধরনের পরিবর্তন বা উত্তরণ আন্দাজ করতে পারে না, সমকালীন সাহিত্য তা পারে। অর্থাৎ সমাজ-দর্পণ রূপে তিনি এগিয়ে রাখেন সাহিত্যকে। সাবল্টার্ণ স্টাডিজে তাঁর সহকর্মীরা যে ভাবে ভাষা বা সাহিত্যিক মাধ্যম বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ধরনের ইতিহাস পাঠ শুরু করেছিলেন, এ কি তারই এক স্বীকৃতি? তাঁর এই মতামতের চূড়ান্ত চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় উৎসর্গে — তিনি এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন কোনও ঐতিহাসিক নন, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের লেখক রামরাম বসুকে। তাই বলা যায় এ গ্রন্থ ইতিহাস চর্চা থেকেও ক্রমশ ইতিহাস বোধকে গুরুত্ব দিয়ে সামগ্রিক মনন প্রসঙ্গের কেন্দ্রিকতা তুলে ধরে।

আসলে তিনি বহমান চিন্তাজীবির মতোই সরছিলেন বহুকাল ধরেই। যদিও তিনি ইতিহাসে হয়ত বা স্মরণীয় থাকবেন সাবল্টার্ণ স্টাডিজের জনক রূপে, কিন্তু তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধান অনেক দিন আগেই তাঁকে প্রান্তীয় ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত বা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই প্রান্তীয় চৈতন্যের

উদ্ঘাটন তাঁর লক্ষ্য হলেও ইতিহাসের চর্চা-পদ্ধতিতে আকর তথ্যভিত্তির অপ্রতুলতা তাঁর এই অনুসন্ধানের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। ফলে তাঁর অনেক সহ-গবেষকরাও সাবল্টার্ণ স্টাডিজে আদতে প্রান্তীয় কণ্ঠস্বরের ক্ষীয়মাণ ধারায় কিছুটা হতাশ হয়েই অন্য পথ ধরছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতিই বিশেষত ঔপনিবেশিক সমাজ অনুধাবনে সরকারি নথি ছাড়াও অন্যান্য সূত্র সন্ধানে উৎসাহিত করে আদতে ইতিহাসের বৃত্ত বিস্তৃত করেছিল।

তিনি এর পর সিদ্ধান্ত নেন যা লিখবেন, বাংলাতেই লিখবেন। এবং সে সিদ্ধান্ত নিতান্ত মাতৃভাষা প্রেম নয়, ২০১০ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেন যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে ভাষার আঞ্চলিকতা প্রতিবন্ধক হয়নি, এবং সেভাবেই সে কারণেই তিনিও বাংলা ভাষাতেই লিখতে চান। তার কাছে বাংলাভাষায় রচনা অবশ্য নতুন কিছু ছিল না। তাঁর ১৯৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত আকর প্রবন্ধ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' যা পরে এক্ষণ পত্রিকায় ছাপা হয়, তাও ছিল বাংলাতেই লেখা। তিনি এর পরেও নানা সময়ে বারোমাস, দেশ, অনুষ্টুপ প্রভৃতি পত্রিকায় মাঝেমাঝেই লিখতেন। এবং তার মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ ছিল বস্তুতপক্ষে বাংলাতেই লিখিত, তার কোনও ইংরাজি সংস্করণ নেই। সেই ধারাই বিস্তৃত হল তাঁর জীবন সায়াহ্নে। এ সময়ের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ ও চৈতন্য সম্পর্কে 'কবির নাম ও সর্বনাম' (১৯০৯) এবং রামমোহন প্রসঙ্গে 'দয়া : রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা' (২০১০)। রামমোহন ও আধুনিকতা প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের ভূমিকায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন যে 'দয়া'র প্রসঙ্গ তুলে তিনি কি আমাদের আধুনিকতার ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছেন না? কিন্তু রণজিৎ গুহ ভারতীয় বৈষ্ণবধারায় বহুল প্রচলিত দয়ার ধারণা থেকে ভিন্ন এক ঔপনিষদিক ধারায় দয়া ও সমকালীন প্রেক্ষিতে সহমর্মিতার এক মিশ্র সহযোগের মাধ্যমে রামমোহনের দয়ার ব্যাখ্যা দেন যা বস্তুতপক্ষে ভারতের আধুনিক মনন তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

রণজিৎ গুহের ছাত্র ও সহযোগী অধ্যাপক রিচার্ড প্রাইস তাঁর সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছিলেন, রণজিৎ গুহ ছিলেন আদতে মুক্ত গবেষক, যিনি চিরকাল নিজের অনুসন্ধিৎসা দ্বারা চালিত হয়ে নিজের পথে এগিয়েছিলেন। বস্তুত পক্ষে তাঁর গবেষণার বৈচিত্র্য তাঁর এক সর্বদা উৎকীর্ণ মন ও মননের বিস্তারের কথাই মনে করায়। তাঁকে তাই বোধহয় শুধু মাত্র সাবল্টার্ণ স্টাডিজের বৌদ্ধিক স্তম্ভ না ভেবে তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনশীলতার জন্যই মনে রাখা উচিত। অমর্ত্য সেন যথার্থ বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর ভারতের সবচেয়ে সৃজনশীল ঐতিহাসিক নিঃসন্দেহে রণজিৎ গুহ।

উর্বী মুখোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।